দৈনিক বাংলা

013

তারিখ 19 AUG 1985
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

এসএসসি ঃ পাস-ফেলের খতিয়ান

হোসনে আরা শাহেদ

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার পর ফলাফল জানা গেছে। এই জানাটাও সহজে নয়। বিশেষ কয়েকটি জায়গায় রেজাল্ট টানিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘোষণা শুনে মানুষ দৌড়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষার পর ফল জানা গেছে। এই ফল জানতে গিয়ে কৌশল কসরৎ দুটোই প্রয়োগ করতে হয়েছে। উৎকণ্ঠিত অভিভাবককে আপিস ছুটি নিতে হয়েছে, স্কুলগুলোকে ক্লাস বাদ দিয়ে টীচার পাঠিয়ে বসিয়ে রাখতে হয়েছে। টেলিফোনের কাছে বিমূর্ত প্রহর অতিবাহিত করতে হয়েছে। ফলাফল ঘোষণার পরেও এই ঢাকা শহরে কারও কারও জানতে আঠারো থেকে চব্বিশ ঘন্টা লেগেছে। এই ফলাফল ঘোষণার আগে গুজব রটেছে। এ গুজব অনেক ধরনের। গুজবে পরীক্ষার্থীরা ভিরু পাখীর মতো কেঁদেছে। গুজব ছাড়াও, বহু আজগুবি ঘটনা ঘটেছে। কোথাও কোথাও খাতা গায়েব হয়েছে, টেবুলেশন সীট নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। এসব ঘটনা পত্রিকায় শুনে যারা পরীক্ষা দিয়েছে, তারা বিধাতার কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল গোপনে পূর্বাহ্নে ভুল বা ঠিকভাবে জানিয়ে দিয়ে কেউ কেউ নাকি ফায়দাহ লুটেছে।

অবশেষে ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। ঘোষণার আগে তারিখ নিয়েও জল্পনা-কল্পনা হয়েছে! শীগগীরই বের হচ্ছে—এমন ভাববাচ্যটি একদিন বলে বসলো কাল বের হতে পারে? এমনি সকলের সকল কাজ লাটে উঠলো। সেই কালের জন্য পত্রিকা অফিসে ধর্ণা শুরু হলো। হাট-বাজার-রেশন বরাদ্দ করে লোকে রেজাল্ট জানার জন্য মরিয়া হলো। শেষে জানা গেলো—না, কাল নয়, ফলাফল বের হবে অচিরেই। এমনি করে ধাপে ধাপে উদ্বেগ সৃষ্টি করে, স্তরে স্তরে উৎকন্ঠা তৈরি করে প্রচুর মেহনতের মধ্য দিয়ে ফলাফল জানা গেল। অথচ একজন অভিভাবক যখন ফরম পূরণ করে ফিস দাখিল করেন, তিনি আশা করতে পারেন—তাঁর সন্তানের ফলটুকু স্বস্তিতে জানা যাবে। এ প্রত্যাশা তাঁর অতি আশা নয়, এ প্রত্যাশার অধিকার তাঁর অনধিকার নয়। মাত্র কিছুকাল আগেও স্কুলে স্কুলে ফলাফলের এই সংশ্লিষ্ট বোর্ডের গাড়ি করে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। আজ কি কারণে সে নিয়মটুকুও উঠে গেছে, এ জিজ্ঞাসা অনেকের মনে।

জিজ্ঞাসা জেগেছে এসএসসি ফলাফলের মান নিয়েও। এবারের ফলাফলে আশার ছবি নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠই ফেল। ফেল কেন সে কথা কি ভেবে দেখেছেন সংশ্লিষ্টরা? নতুন সিলবাসের নতুন বই যখন ছাত্ররা মাসের পর মাস পায়নি, কেন কেউ কারণ জানতে চাননি? কেন সেসনের সাত মাস পর যখন বিজ্ঞান ও মানবিক—এই দ্বিমুখী ধারার প্রবর্তন হয়। কেন সে সম্পর্কে বোর্ড ব্যাখ্যা দেননি? নতুন বইয়ের নতুন জটিলতা নিয়ে কেন প্রশ্ন তোলা হয়নি? কেন দেখা হয়নি যে এসব বইয়ের ছাপার এতো ভুল, একেক পাতায় একেক বানান, এর কোনটা অনুসরণ করবে ছাত্ররা? এর প্রতিকারও বা কি?

নতুন পাঠক্রম আর পাঠ্যসূচীর প্রশ্নের ধারা যখন সেসনের দেড়টি বছর পরে এলো, ছাত্ররা বিস্মিত হলো, ভয় পেলো কি তারা করবে এখন। নির্বাচনী পরীক্ষার পূর্বক্ষণে যখন মান বন্টনের নির্দেশিকা পৌঁছালো, ছাত্ররা হতবাক হলো। তারা কিইবা করতে পারে?

ছাত্ররা স্কুলে গেছে, নতুন পাঠ ভালোভাবে বুঝতে না পারলেও নীরব থেকেছে, না-বুঝে মুখস্তের চেষ্টা চালিয়েছে।

অল্প সময়ের মধ্যে বিষয় পরিবর্তনে ছাত্রদের নির্বিকারই থাকতে হয়েছে। শিক্ষক আর অভিভাবকদেরও। পরীক্ষার হলে পুরনো সিলেবাস নতুন সিলেবাসের একই কাগজে সংমিশ্রিত প্রশ্নে বেওকুফ বনেছে, বিভ্রান্ত হয়েছে। সবশেষে এসেছ ফলাফল—ফল ও অফলের সংমিশ্রণ।

এক হিসাবে শিক্ষার্থীদের আমরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিণত করেছি। ছাত্ররা স্কুলেও তেমন শিক্ষক পায় না—বাড়িতেও বিশেষ-শিক্ষক কল্পনা করতে পারে না। পরিবর্তনের হেরফেরে তারা দিশাহারা।

আজকের এসএসসি রেজাল্টে শিক্ষাঙ্গনের সমস্যাই প্রতিফলিত। ফার্স্ট ডিভিশনে যারা পাস করেছে তাদের সংখ্যা নগণ্য। দ্বিতীয় বিভাগেই সংখ্যা লঘিষ্ঠদের স্থান। তৃতীয় বিভাগেই পাস করেছে সংখ্যাগরিষ্ঠরা। এর কারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য। বৈষম্য স্কুলে স্কুলে, বৈষম্য শহরে-গ্রামে, বৈষম্য পরিবারে-পরিবারে। সরকারী আর বেসরকারী—শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিষ্কার দুটি প্রান্ত।

যে ছাত্রটি আজ ব্যর্থ হলো, তারাও সম্ভাবনা ছিল। তার মন, মেধা বুদ্ধি হয়ত কোনও অংশেই কম নয়। কিন্তু তাকে শিক্ষিত করে তোলা হয়নি। তোলা গেল না।

সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যে আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে আদর্শ সে কথা বলা যাবে না। কিন্তু তবুও যা হোক টাকা-পয়সার জোরে বলা চলে। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কি দশা? বেসরকারীর জন্য বরাদ্দ যে অংক উদাহরণ করা হয়, তাতে প্রশ্ন জাগে—কত সংখ্যকের জন্য মোট, বরাদ্দের এ কতো অংশ? পার্সেনটেজটাই জরুরী। অথচ সেই জরুরী কথাটিই চাপা পড়ে যায়।

এসএসসি পরীক্ষায় এই যে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হল সে কি শুধু তাদেরই দায়দায়িত্ব? শিক্ষা বোর্ড অভিভাবকমন্ডলী আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কি কোন ভূমিকাই এতে নেই। যারা ফেল করেছে তাদের কেউ কেউ হয়ত আবার পরীক্ষা দেবে। কেউ কেউ ঐখানেই লেখাপড়ার পাট সাফা করবে। মানব সম্পদের এই যে বিপুল অপচয়; এই যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র এক বছর পিছিয়ে গেল, এতে কি গোটা জাতিকেই ক্ষতির বোঝা বহণ করাতে হবে না?

পাস ফেলের বিষয়টি কখনও শিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হয় বলে মনে হয় না। পরীক্ষা নেয়ার অর্থ তো বৈরীতা নয়, শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতাও নয়। পরীক্ষা নেয়ার অর্থ হচ্ছে, ছেলেমেয়েরা কতটা শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারই পরিমাপ করা। আসলে এসএসসি পরীক্ষায় আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থারই একটা যাচাই হয়ে গেছে। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রই অকৃতকার্য হয়েছে সেহেতু একথা বললে অন্যায় হবে না যে ছাত্র-ছাত্রীরা পাসফেল যাই ফল করে থাকুক, শিক্ষা বোর্ডগুলি নিশ্চিতভাবেই ফেল করেছে।

বইপত্র, পাঠ্যক্রম ইত্যাদি নিয়ে যে ঘাপলা হয়েছে, শিক্ষা বোর্ডগুলি কি তার দায়িত্ব এড়াতে পারবেন? আগেই উল্লেখ করেছি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নানা বৈষম্য—সেইসব বৈষম্য এবং ভাবনাচিন্তা হীন পদক্ষেপ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রের অকৃতকার্যতার জন্য দায়ী।

শিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের দেশে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই! থাকলে পাশের আয়োজনটাই বড় হত, ফেলের সংখ্যা নয়। তিন লাখের কিছু বেশি সংখ্যক ছাত্র এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে—যদি আমরা জানতাম জাতীয় অগ্রগতির জন্যে সবারই পাস করা প্রয়োজন তাহলে শিক্ষার ব্যবস্থাও সেরকমই হত। কিন্তু আমরা এরকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখাপড়া করি, ব্যক্তিগত উদ্যোগে। কোন বৃহৎ গঠনমূলক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয় শিক্ষাদান ব্যবস্থা। ফলে পাস ফেলের হারে তারতম্য ঘটলে কিছুই আসে যায় না আমাদের।

এ কারণেই এসএসসি বা এমনি ধরনের পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে আমাদের এমন ঔদাসীন্য ফল প্রকাশের কোলাহল স্তিমিত হলে পুরনো নিয়মে পুরনো ছকের মধ্যে ফিরে যাই। কেউ ফেল করে কেউ পাস—সবই যেন ভাগ্যের ব্যাপার। শিক্ষাদানের ব্যাপারটি কিছুতেই এরকম হওয়া উচিত ছিল না।